"জাতীয় শোক দিবস বনাম বঙ্গবন্ধুর রক্তের উত্তরাধিকার"

মো: আলী আজম

আগস্ট ১৫, জাতীয় শোক দিবস এলেই একটা প্রশ্ন অবশ্যাম্ভাবীরুপে সবার মুখে মুখে ফিরে- বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার আর কতদূর? এই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে আরো তীব্র হয় বিশেষত: বঙ্গবন্ধুর রক্তের উত্তরাধিকারী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র ক্ষমতায় এলে। খুনীচক্র এবং তাদের মদদদাতা সুবিধাভোগীদের পরিচয় নিয়ে গোড়া থেকেই বাঙ্গালীর কোন সংশয় ছিলনা। তাদের বর্বরতা এবং দোর্দন্ড প্রতাপের মুখে অসহায় মানুষ এর প্রতিকারের ভার প্রকৃতির উপর ছেড়ে দিয়েছিল, একসময় এমনও মনে হয়েছে বাংলার মাটিতে এ অবিচারের বিচার বুঝি কোনদিনও হবেনা। কিন্তু অস্তিত্বের সঙ্কটে প্রতিটি শোক দিবসে বাঙ্গালী আত্মানুসন্ধানে বাধ্য হয়েছে, শোকের তাৎক্ষণিক মাত্রা থেকে বেরিয়ে এসে তার ব্যাপকতা এবং চরম পরিণতি উপলব্ধি করেছে হাড়ে হাড়ে। চলমান সময় পাপীদের পাপের পরিধি মেপেছে, প্রায়শ্চিত্ত বিধানে জনমত গঠন করেছে। এ'ছাড়া ইতিহাসের আর কোন গত্যান্তর ছিলনা।

কারন, সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের জঘন্যতম ষড়যন্ত্রের শিকার হয় মুলত: বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী জাতি। এই নির্মম,রক্তাক্ত অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে ষড়যন্ত্রকারী খুনী এবং তাদের নেপথ্য মদদদানকারী, সুবিধাভোগী গোষ্ঠী বাঙ্গালীর জাতীয় চেতনা,বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্বকেই মুছে দিতে সর্বোতভাবে চেষ্টা করেছে । তার প্রমান পাওয়া যায় অব্যাহত রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস,সহিংসতার ধারাবাহিকতা এবং সংবিধানের মূল চরিত্র হনন, জাতীয় পরিচয় পাল্টে দেয়া, মুক্তিযুদ্ধে আওয়ামী লীগের অবদান প্রশ্নবিদ্ধ করা,স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় সঙ্গীতের বিরুদ্ধে অব্যাহত অপপ্রচারে। এই দুষ্কর্ম সার্থক করতে তাদের প্রথম প্রয়োজন ছিল বাঙ্গালীর কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধের গৌরব ছিনিয়ে নেয়া। বঙ্গবন্ধুকে চিরতরে বাঙ্গালী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া। বলাবাহুল্য বন্দুকের নলের জোরে কাগজে কলমে অনেক কিছু সম্ভব হলেও বাস্তবের জমিনে বঙ্গবন্ধু এবং বাঙ্গালীকে আলাদা করা সম্ভব হয়নি। ফলত: ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করেও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা টিকে থাকে। স্বাভাবিকভাবে তা বঙ্গবন্ধুকে আশ্রয় করেই পুন:প্রতিষ্টার সংগ্রাম চালিয়ে যায়। বাঙ্গালীর ইতিহাস-ঐতিহ্য, প্রগতির বিরুদ্ধে প্রতিটি লড়াই সংগ্রামে দ্বিগুন শক্তিতে চেতনার দীপ্ত মশাল হয়ে দেখা দেন বঙ্গবন্ধু। জনকের মধ্যে জাতি আত্মশক্তি ও আত্মপরিচয় খুঁজে নেবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তারপর ?

বাঙ্গালী ও বঙ্গবন্ধুর এই অবিনশ্বর একাত্মতা, অদম্য সাহসিকতা ও নিষ্ঠার ফসল স্বরুপ, নানমুখী ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদকালের জন্যে প্রথমবারের মত বঙ্গবন্ধুকন্যার নেতৃত্বে রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভ করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ । সঙ্গতকারনে সবার মধ্যে এমন একটা ধারনা ছিল সরকার প্রধান হিসেবে শেখ হাসিনা, প্রতিশোধ পরায়ন না হয়েও বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার কার্য্যকে অন্তত: মূল এজেন্ডা হিসেবে নেবেন। জনমনে এমন আকুতিও ছিল সরকার অন্তত: খুনীদের ধরে এনে খোলা ময়দানে ছেড়ে দিক, বাকীটা এদেশের মানুষই করবে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর রক্তের উত্তরাধিকারী বঙ্গবন্ধুর মতোই মানবিকতায় উদ্ভাসিত হলেন। কুখ্যাত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল থেকে শুরু করে খুনীদের বিচার কার্য্যের আওতায় আনা পর্য্যন্ত কোন কিছুতেই তিনি জোর খাটালেননা, বিশেষ ব্যবস্থার আশ্রয় নিলেননা। জাতীয় সংসদেই পাস হল 'ইনডেমনিটি' রহিত করন বিল। সাধারণ খুনের মামলার মত প্রচলিত বিচার ব্যবস্থায় শুরু হল জাতির জনক হত্যা মামলার

কার্য্যক্রম। স্বৈরাচারের খুদ-কুঁড়ো খেয়ে মানুষ হওয়া দীর্ঘদিনের স্বৈরাচারী কায়দা কানুনে অভ্যস্ত আমলা তন্ত্র এবং বিচার বিভাগে লুকিয়ে থাকা তাদের সহযোগী, সুবিধাভোগীদের অপতৎপরতায় প্রচলিত দীর্ঘসূত্রিতাকেও ছাড়িয়ে যেতে থাকলো বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার কার্য্যক্রম। খুনীচক্রের দোসররেরা শেখ হাসিনার প্রান নাশের ষড়যন্ত্র চালানোর সাথে সাথে বাজারে ছড়াতে থাকে- আওয়ামী লীগই বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার চায়না বরং আন্দোলনের ইস্যু হিসেবে জিইয়ে রাখতে চায়। স্বৈরাচারী ক্ষমতার বেপরোয়া ব্যাপক প্রয়োগ দেখতে অভ্যস্ত সাধারন জনমনেও প্রশ্ন জাগে সরকার চাইলে কি না পারে? । কিন্তু তাতেও বঙ্গবন্ধু কন্যা অন্তত: বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারকার্য্যে তড়িঘড়ি কোন উদ্যোগ নেননি। জীবনে যেমন মরনেও তেমন বঙ্গবন্ধুকে তিনি সাধারণ বাঙ্গালী থেকে বিচ্ছিন্ন করেননি। বঙ্গবন্ধুর মাজার সংরক্ষণ করেছেন কিন্তু সহজাত বাঙ্গালী ধর্মপরায়নতা,আবেগ-অনুভূতির বশে থেকে তা টুঙ্গিপাড়া থেকে ঢাকায় স্থানান্তর করেননি। এক্ষেত্রে বিজ্ঞজনদের শত যুক্তি,উদাহরনেও তাঁকে টলানো যায়নি। যার প্রয়োজন পড়বে সে সাত সাগর তের নদী সাঁতরে যাবে বাইগার নদীর তীরে, অক্সফামের খয়রাতি পুল দিয়ে জনসমাগম করে রাজনৈতিক প্রদর্শনীর প্রয়োজন কী?

১৯৯৬-২০০১সালে রাষ্ট্র ক্ষমতার মেয়াদে কৃষি উৎপাদনে স্বয়ংসম্পুর্নতা অর্জন থেকে শুরু করে গঙ্গার পানি বন্টন সমস্যা, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি শরণার্থী সমস্যা কোন রকম তৃতীয় পক্ষীয় মধ্যস্থতা ছাড়া সমাধান, জাতি সংঘ কর্তৃক একুশে ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষনায় গুরুত্বপূর্ন অবদান রাখার মত সাফল্যের পাশাপাশি সরকারপ্রধান ব্যক্তিগতভাবেও দেশ-বিদেশের নানা সম্মান অর্জনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে সসম্মানে তুলে ধরেন। বেপরোয়া গতিতে বেড়ে চলে ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্তও। কোটালি পাড়ার মাঠে ৭৬ কেজি ওজনের বোমা আবিষ্কার তার অন্যতম উদাহরণ। পরবর্তীতে চারদলীয় জোট সরকারের পূর্ন মেয়াদকাল এবং তারই বর্ধিত সংস্করনের পাঁচ মিশালী তত্বাবধায়ক সরকারের দুই বছর ঘুরে ফিরে একই চক্রান্ত চলতে থাকে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ,বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর রক্তের উত্তরাধিকারী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে। তন্মধ্যে জোট সরকারের পুরো সময় জুড়ে অবাধ লুঠপাট,দুর্নীতি,হত্যা,ষড়যন্ত্র দেশকে আইয়্যামে জাহেলিয়াতের পর্য্যায়ে নিয়ে যায়। বঙ্গবন্ধুর খুনী ঘাতক চক্র এবং যুদ্ধাপরাধী উগ্র মৌলবাদীরা মরিয়া হইয়া উঠে জাতীর প্রতিবাদী মঞ্চ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুর রক্তের উত্তরাধিকারী শেখ হাসিনাকে হত্যার মাধ্যমে ৭৫এর ১৫ই আগস্টের অসমাপ্ত কু-কর্ম সম্পুর্ন করতে।

একের পর এক আওয়ামী লীগের জনপ্রিয় নেতা,সংসদ সদস্য হত্যা, বর্বরতার চুড়ান্ত পর্য্যায়ে শেখ হাসিনার জন সভায় ২১ শে আগস্টের গ্রেনেড হামলা। জান কবুল রাজপথের আন্দোলনে তত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্টা করা গেলেও তার চরিত্রও থেকে যায় তেমনি গণ-বিরোধী। পতিত জোট সরকারের দুর্নীতিবাজ নেতা-নেত্রীদের সাথে গোত্রভুক্ত করে তাদের হাতে নির্য্যাতিত আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদেরও জেল জুলুমের শিকার হতে হয় সমতা বিধানের নামে। সাফ সুতরো সার্টিফিকেট দেয়া হয় পতিত জোটের যুদ্ধাপরাধী মৌলবাদী অংশীদারকে। শেখ হাসিনাকে বিশেষ জেলে কারাবন্দী করে সমালোচনা এড়াতে এক পর্য্যায়ে পতিত জোট সরকার প্রধানকেও বন্দী করা হয়। আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনাকে চিকিৎসার জন্যে বিদেশে যেতে দেওয়া হয় বটে তবে ফেরত আসার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারী করে, এমনকি বিদেশী এয়ারলাইন্স সমূহকেও জানিয়ে দেয়া হয় যেন কেউ তাকে বাংলাদেশে পরিবহন না করে। দেশে মাঝে মধ্যে নিয়মিত বিরতিতে গুজব ছড়ানো হয় জোট নেত্রীকেও বিদেশে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। কিন্তু সেটা শোনা যায়, পড়া যায় বাস্তবে দেখা যায়না। বস্তুত: তত্ববধায়ক সরকারের দুই বছরের এজেন্ডাই ছিল যেন পতিত জোট সরকারের কু-কীর্তিকে জনমন

থেকে মুছে দেয়া এবং ২১ শে আগস্ট গ্রেনেড হামলায় যা সম্ভব হয়নি অর্থাৎ শেখ হাসিনাকে প্রানে বাঁচিয়ে রেখেও রাজনীতি থেকে হটিয়ে বাঙ্গালীর প্রতিবাদী কণ্ঠকে স্তব্দ করে দেয়া।
প্রবল জনমতের চাপে তাতেও ষড়যন্ত্রকারীদের শেষ রক্ষা হয়না। নির্বাচন দেয়া ছাড়া কোন গত্যান্তর থাকেনা। প্রায় দেড় কোটি ভূয়া ভোটার মুক্ত , ছবিযুক্ত নুতন ভোটার তালিকা সম্বলিত এবং মোটামুটি প্রভাবমুক্ত নির্বাচনে অংশ গ্রহন করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোটকে নিরঙ্কুশ বিজয়ী করে আনে সাত বছর অকথ্য রাষ্ট্রীয় নির্য্যাতনের শিকার বাঙ্গালী জনসাধারন। প্রধানত: দুর্নীতি দমন, খাদ্যে স্বয়ংসম্পুর্ণতা অর্জন,মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পুন:রুদ্ধার, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার,বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের রায় কার্য্যকর করা, উগ্র মৌলবাদ তথা জঙ্গীবাদ নির্মূল করার মধ্য দিয়ে দিন বদলের সনদ জনমনে ব্যাপক সাড়া তোলে। নির্বাচনী মহাজোটের পক্ষে গণরায়ে অভিষিক্ত হয়ে আবারও সরকার গঠন করেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। প্রচার মাধ্যম সমূহে যৌক্তিকভাবেই বলা হয় এই রায় যেন ১৯৭০এর গণ-রায়। আর দু:শাসনের অবশিষ্ট বাংলাদেশও যেন পাক হানাদারের রেখে যাওয়া পোড়া মাটির ভাঙা ঘর।

সঙ্গতভাবেই ধারনা করা হয়েছিল জীবনের উপর অব্যাহত হুমকিকে আমলে নিয়ে হলেও জননেত্রী শেখ হাসিনা এবার অন্তত: বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার শেষটুকুতে বাড়তি নজর দেবেন, বিগত জোট সরকারের প্রতিটি জোর-জুলুম, চক্রান্ত-ষড়যন্ত্রের সমুচিত পাল্টা জবাব দেবেন। ইটের জবাব পাথরে দিয়ে ইতিহাসের দেনা-পাওনা চুকিয়ে দেবেন। কিন্ত চলতি ধারনাকে পাশ কাটিয়ে সরকার যাত্রা শুরু করলো বাংলার মাটি ছুঁয়ে। কোন রকম দ্বিধা দ্বন্ধে না গিয়ে কৃষি উৎপাদনে সার-ডিজেলের মূল্য ভর্তুকি ঘোষনা করে। বঙ্গবন্ধুর দর্শন আবারো প্রতিভাত হয়। রাষ্ট্রীয় কোষাগার শুন্য, যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে যখন রাজস্বের প্রয়োজন সর্বাধিক তখনও বঙ্গবন্ধু নির্দ্বিধায় ২৫ বিঘা জমির খাজনা মাফ করেছিলেন না চাইতেই। ভূমি মালিকানায় কৃষকের স্বার্থ রক্ষায় জমির সর্বোচ্চ সিলিং নির্ধারন করেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে, পক্ষান্তরে উল্লেখ করতেই হয়, ভুমি মালিকানায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তথা জমিদারী উচ্ছেদের দাবী পুর্ব বাংলায় পাকিস্তান আন্দোলনের ভিত্তি হলেও পাকিস্তান সরকার যাত্রা শুরু করেছিল চট্টগ্রামের মাদার্শায় বিক্ষোভরত কৃষকদের লাশ ফেলে। দুর্ভিক্ষ পেরিয়ে, জনগনের টাকায় জমিদারদের ক্ষতিপূরন দিয়ে প্রজাসত্বের বিধান দিতেও লাগে সাত বছর, প্রয়োজন হয় নৌকা মার্কার যুক্ত ফ্রন্ট সরকার। পাকিস্তানের মত , স্বাধীন দেশে পাকিস্তানী ধারার সরকারও কৃষককে সার চাইলে গুলি উপহার দিতে কার্পন্য করেনা।

সরকারের দর্শনই যদি এমন হয় যে, দেশে খাদ্যাভাব থাকা ভাল তাতে বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যায়, আই এম এফ'র পরামর্শে খাদ্য গুদাম বেচে দেয়া হবে কারন প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশকে খাদ্য সরবরাহ করবে যখন যা দরকার তাহলে প্রতিবেশী রাষ্ট্রদূতের কটু কথা হজম করতেই হবে। ভাগ্যবাদী কৃষকের জন্যে সেই সরকারও প্রাকৃতিক উপদ্রবের মত মুর্তিমান আসমানী গজব বৈকি। এই গজব থেকে পরিত্রান পেতেইতো দিন বদলের সরকার। যার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকারে নিহিত বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার স্বপ্ন। খেটে খাওয়া সাধারন মানুষের অবস্থার উন্নয়ন এই স্বপ্নের প্রাণকেন্দ্র। সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের উদাহরন পাওয়া যায় ইতোপুর্বে বন্ধ হয়ে যাওয়া মিল কারখানা চালুর উদ্যোগে, বাজার মুল্যের চেয়ে বাড়তি দরে ধান-চাউল সংগ্রহে সরকারী নীতিতে, তৈরী পোশাক শিল্পে নিয়োজিত খেটে খাওয়াদের জন্যে রেশনিং ব্যাবস্থা, অসহায় প্রবাসীদের জন্যে যথাযত ক্ষেত্রে প্রবাসে মৃত্যুর ক্ষতিপুরণ দুই লক্ষ টাকায় উন্নীতকরণ, এবং আবারো কৃষি- খরা পীড়িত উত্তর বঙ্গে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে বিনামূল্যে সেচ সুবিধা প্রদানের উদ্যোগে। এসব

উদ্যোগেরই পুরোপুরি না হলেও ফসল এই যে, অনেকদিন পর বাংলাদেশের কৃষক পাটের ন্যায্য মূল্য পেয়ে খুশী। খাদ্যশস্যের মজুদ গড়তে সরকারী গুদামের টান পড়েছে। প্রতি মাসে রেকর্ড় ভেঙ্গে রেকর্ড় গড়ছে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ। বিশ্ব ব্যাপী মহামন্দা আর ঘরোয়া ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে যাচ্ছে পোষাক শিল্প। সরকারের অতিক্রান্ত ছয়মাস সময়কালে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে তত্বাবধায়ক সরকারের নিয়োগকৃত খতিব নিয়ে ধান্ধাবাজ মৌলবাদীদের জুতোমারা উৎসব দেখে হতবাক বাঙ্গালী। বিডিআর বিদ্রোহের মত ভয়াবহতম ষড়যন্ত্রও মোকাবিলা করেন সরকার অত্যন্ত দক্ষতার সাথে। দেশজুড়ে একের পর এক ভয়ংকর আন্তর্জাতিক মৌলবাদী জঙ্গী ধরা পড়তে থাকে। সরকারের সাফল্যে যতোটা উচ্ছসিত বাংলাদেশ, আশাবাদী বাঙ্গালী তারচেয়েও বেপরোয়া ষড়যন্ত্রকারীদের তৎপরতা। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর জীবনের নিরাপত্তা এখন বাংলাদেশ ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও আলোচিত বিষয়।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পুনরুদ্ধারে নির্বাচনী ওয়াদা মোতাবেক যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রয়োজনীয় জোগাড়-যন্ত্রের আভাস পাওয়া যায়। তারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ পরিচিত স্বাধীনতা বিরোধী যুদ্ধাপরাধীমহলের অপতৎপরতাও লক্ষ্যনীয়। এই প্রেক্ষাপটে সঙ্গতকারনেই সাধারণের প্রত্যাশা ,বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার শেষটুকু ত্বরিৎ গতিতে নিস্পন্ন করবেন সরকার । কিন্তু এক্ষেত্রে এখন পর্য্যন্ত গতানুগতিক ধারায় কিছু কিছু বিচারপতি নিয়োগ দান'র মধ্যে সরকারী উদ্যোগ সীমিত। উদ্বেগাকূল বাঙ্গালী গভীর শঙ্কায় লক্ষ্য করে- জাতির জনকের আজন্ম লালিত দর্শনের প্রতি কতোটা গভীর আস্থায় নিবেদিত, নি:শঙ্কচিত্ত প্রধানমন্ত্রীর অবিচল ভূমিকা। তিনি আঁকড়ে ধরেছেন ববঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের অত্যাবশ্যকীয় শর্ত বঙ্গবন্ধুর দর্শন- শত বিপদ বাধার মুখেও মাটি ও মানুষের কাছাকাছি থাকা। সেই দর্শনের অনুবর্ত্তী সিদ্ধান্ত - বিশেষ ব্যবস্থা, প্রাগ্রসর বন্দোবস্ত খেদ মেটানোর উপায় হতে পারে তাতে বঙ্গবন্ধুর মানবিকতা থাকেনা, সাধারনের কাতারেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু অসাধারণ। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রাগ্রসর বাংলাদেশই হতে পারে বঙ্গবন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রকৃষ্ট উপায়। বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার সাধারন নিয়মেই চলুক তবে বিচার প্রক্রিয়া যেন শেষ পর্য্যন্ত অব্যাহত থাকে, পর্দার আড়ালের কোন অপশক্তি যেন তা বাধাগ্রস্থ না করে, স্বাধীন বিচার বিভাগের মাধ্যমে সরকার এই নিশ্চয়তাটুকু বিধান করুন। অন্যায়কে প্রশ্রয় না দিয়ে ন্যায় প্রতিষ্ঠার এই বেদনাসিক্ত কঠিন যাত্রাপথে বঙ্গবন্ধুর রক্তের উত্তরাধিকারী বাঙ্গালীর গৌরবোজ্বল ইতিহাসকে আরো মহিমান্বিত করতে সমর্থ হবেন, লক্ষন ইতোমধ্যেই পরিষ্কার।